Vol. 39 | No. 2 | 1996

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

জগদীশ গুপ্ত'র প্রথম গল্প

Volume	39
Issue	2
Year	1996
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	লায়লা জামান
Published online	February 1, 1996
DOI	10.62328/sp.v39i2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v39i2.6
Pages	124-133
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

জগদীশ গুপ্ত'র প্রথম গল্প

লায়লা জামান

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ব্যতিক্রমধর্মী লেখক জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) -র প্রথম প্রকাশিত মৌলিক[১] গল্প কোন্‌টি ? এ সম্পর্কে গবেষকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। এই মতানৈক্যের কারণ তাঁর প্রথম মৌলিক গল্পটি এতদিন কারো নজরে পড়েনি।

ড. সুকুমার সেন জানিয়েছেন 'বিজলী'-পত্রিকায় ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ২৯ ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত "পেয়িংগেস্ট" জগদীশ গুপ্ত'র প্রথম মৌলিক গল্প।[২] জগদীশ গুপ্ত'র 'গল্প সমগ্র' (প্রথম খণ্ড) সংকলনে অন্যতম সম্পাদক নিরঞ্জন চক্রবর্তীও একই তথ্যের পুনরাবৃত্তি করেছেন।[৩]

আবুল আহসান চৌধুরী বাংলা একাডেমীর জীবনীগ্রন্থমালায় সুকুমার সেনের এই তথ্য সংশোধন করে লিখেছেন,

> ড. সুকুমার সেনের ভুল তথ্য অনুসরণে সকলেই বলেছেন যে জগদীশ গুপ্তর প্রথম মৌলিক গল্প 'পেয়িংগেস্ট' প্রকাশিত হয় 'বিজলী'-পত্রিকায় (২৯ ফাল্গুন ১৩৩১)। কিন্তু একটু সতর্ক অনুসন্ধান করলে তাঁরা জানতে পারতেন যে এই তথ্য সঠিক নয়।

আবুল আহসান চৌধুরীর মতে, জগদীশের প্রথম মৌলিক গল্প 'তিনটি চুমু' প্রকাশিত হয় 'বিজলী' পত্রিকায় ১৭ মাঘ ১৩৩১ সালে।[৪] তিনি জানিয়েছেন, জগদীশ গুপ্ত লিখিত প্রথম গল্প 'জহর' নানা কারণে পরে প্রকাশিত হয় (কল্লোল: কার্তিক ১৩৩৩)।

ঢাকার 'প্রাচী'-মাসিক পত্রে জগদীশ গুপ্ত'র "অহেতুক" নামে একটি ছোটগল্প পাওয়া গেছে। সুনীলচন্দ্র বসু সম্পাদিত এই পত্রিকায় আষাঢ় ১৩৩১ সংখ্যায় গল্পটি মুদ্রিত। অর্থাৎ 'তিনটি চুমু' ও 'পেয়িংগেস্ট' প্রকাশকালের ৭/৮ মাস আগে মুদ্রিত 'অহেতুক' তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প।

'পেয়িংগেস্ট' চলিত ভাষায় লেখা, 'তিনটি চুমু' গল্পটি অগ্রন্থিত, 'বিজলী'-পত্রিকার ওই সংখ্যাটি আমরা দেখিনি। 'অহেতুক' সাধু ভাষায় লেখা তবে সংলাপ চলিত ভাষায়।

'অহেতুক' প্রকাশকালে জগদীশ গুপ্ত'র বয়স চল্লিশ। সিউড়ি (১৯০৮-১১) সম্বলপুর (১৯১২-১৩) পাটনা (১৯১৮-১৯)-র চাকরি শেষে কুষ্টিয়ায় পৈত্রিক বাড়িতে বসবাসকালে এই গল্পটি প্রকাশিত হয়।

'প্রাচী'-পত্রিকায় একই সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসুরও প্রথম গল্প 'একটা বসন্তের দিন' প্রকাশ শুরু হয়। দুই কিস্তিতে মুদ্রিত গল্পটি শেষ হয় শ্রাবণ ১৩৩১ সংখ্যায়।

সুকুমার সেন, সুবীর রায়চৌধুরী,[৫] নিরঞ্জন চৌধুরী, আবুল আহসান চৌধুরী প্রমুখ জগদীশ গুপ্ত'র প্রকাশ মাধ্যম 'ভারতী', 'বিজলী', 'গুপ্তের গল্প', 'দীপিকা', 'জাগরণ', 'কল্লোল', 'কালি-কলম', 'বঙ্গবাণী', 'উত্তরা', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'প্রবর্ত্তক', 'সোনার বাংলা', 'নবশক্তি' 'বিচিত্রা' প্রভৃতি সাময়িকপত্রের উল্লেখ করেছেন।

আমরা আরো কয়েকটি পত্রিকায় তাঁর অগ্রন্থিত গল্প ও কবিতা পেয়েছি—'আনন্দবাজার পত্রিকা' (বার্ষিক ও শারদীয় সংখ্যা), 'যুগান্তর' (শারদীয়), 'পাঞ্চজন্য' (চট্টগ্রাম), 'হিন্দুস্থান', 'পূর্ণিমা' ইত্যাদি।

উত্তম পুরুষে লেখা 'অহেতুক' রচনাটিকে আঙ্গিকের বিচারে পূর্ণাঙ্গ ছোটগল্প অভিধায় চিহ্নিত করা যাবে না হয়তো, রচনাটি নকশা-জাতীয়।

চারটি উপবিভাগে বিন্যস্ত এই স্কেচধর্মী লেখায় নায়ক একজন কবি। পাশের বাড়ির নরেন বাবুর নবাগতা নবপরিণীতা স্ত্রীকে নিয়ে এই গল্পের কাহিনী। গল্পের কাহিনীটি পরিণতি লাভ করেনি।

'কল্লোল', 'কালি-কলম', 'বঙ্গবাণী'র লেখকগোষ্ঠীর অন্যতম অনতিতরুণ ব্যতিক্রমী লেখক জগদীশ গুপ্ত বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতেও যে নিরীক্ষা করবেন তার আভাস পাই তাঁর এই প্রথম প্রকাশিত মৌলিক লেখায়।

এই গল্পে লেখক কোন সুনির্দিষ্ট পাত্র-পাত্রীর জীবনকাহিনী অবলম্বন করে কাহিনীনির্মাণের সচেতন প্রয়াস পাননি। বরং অনুমান করি, তিনি সযত্নে চেষ্টা করেছেন 'ঘটনার ঘনঘটা' যাতে না ঘটে।

এই গল্পের মুখ্য চরিত্র কবি, পদ্য রচনার বর্ণনা উত্তম পুরুষে দিয়েছেন; তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণার উৎসের বর্ণনা দিয়েছেন চিত্তাকর্ষী ভাষায়, এক ধরনের প্রচ্ছন্ন কৌতুকরস সঞ্চারিত হয়েছে এখানে ;

'যে সমস্ত জিনিষ আছে বলিয়া জানি কিন্তু জন্মে চক্ষে দেখি নাই তাহাদেরই সম্বন্ধে পদ্যাদি লিখি: —সমুদ্র দেখি নাই, গিরি দেখি নাই, সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত, শস্যক্ষেত্র, তাহার উপর বায়ুর লীলা, নদীবক্ষে ছায়া তরঙ্গ ইত্যাদি। স্বচক্ষে ইহাদের কোনটাই

দেখিবার সুযোগ হয় নাই, তবে প্রচুর পরিমাণে কবিতা পড়িয়া একটা সুফল ইহাই হইয়াছিল যে, না দেখিলেও ইহাদের দৃশ্য যেন অনায়াসেই চখের সম্মুখে ভাসাইয়া দিতে পারিতাম।' [পৃ. ৬১]

পাশের বাড়ির নবাগত তরুণীবধূর 'এক পিঠ আর্দ্র এলায়িত দীর্ঘ কেশ, শ্বেতাম্বরের খুব চওড়া রক্তবর্ণ খানিকটা পাড় এবং টুকটুকে আলতাপরা দুখানি চরণ উঠিয়া আসিয়া দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল।' ফলে এই কবির কাব্যসাধনাও বিচলিত হয়ে যায়। 'মিলের শব্দ খুঁজিয়া খুঁজিয়া পদ্য লিখি, কিন্তু ১৭ নম্বরের সিঁড়ির উপর পদশব্দ জাগিয়া আমাকে সাহায্য করা বন্ধ করিয়া দিয়া শব্দানুসন্ধানের ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল।' ... [পৃ. ৬২]

নায়িকার একটি অকিঞ্চিৎকর ঘটনা কবির মনে যে অসামান্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, তার আবেগঘন রূপায়ণ এই গল্প।

'চতুর্দ্দশপদীর সর্ব্বপ্রথম লাইনটা জমাইতে অসাধারণ প্রচেষ্টায় আত্মবিস্মৃতের মত এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে খোলা জানালা দিয়া দৃষ্টি চলিয়া গেল ১৭ নম্বরের সিঁড়ির উপর এবং দেখিতে পাইলাম সেই তরুণী অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া আমাকেই দেখিতেছে। আত্মবিস্মৃতির ঘোর কাটিয়া মুহূর্ত্তেই আমার মুখ ও কান উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, এবং তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া দড়াম করিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিলাম।' [পৃ. ৬৩]

তারপর লেখক– নায়কের অনুতাপ ও উপলব্ধি :

'কেন এ কাজ করিলাম, তাহা তখনও জানিতাম না; কেন সে কাণ্ড করিয়াছিলাম আজও তাহা জানি না।... আমার এই অপরাধের মার্জ্জনা সে কখনও করিতে পারিবে কি?'

রবীন্দ্র-প্রভাবিত এই রচনায় লেখক একটি রোমান্টিক আবেগঘন পরিবেশ নির্মাণ করেছেন। তরুণীকে ক্ষণতরে দেখার প্রতিক্রিয়া কবি নায়কের মনে যে মোহময় আবেশ সৃষ্টি করেছে তার শিল্প-সুষমাময় রূপায়ণ আছে এই রচনার উপসংহারে :

'যাহা সুন্দর তাহাকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিবার যে একটা বিধিদত্ত প্রলোভন জ্ঞান সঞ্চারের সময় হইতে উত্তরোত্তর লেলিহান হইতে থাকে তাহার পরিতৃপ্তির দিক

দিয়াও আমার লোকসান হইল বড় সামান্য নয়। কল্পনায় একটা স্নিগ্ধ পরম সুন্দর মধুর মুখশ্রী সৃষ্টি করিয়া লইয়া বাক্যে তাহার স্তুতি করিবার উপক্রমে যখন বস্তুর উদয়ে কল্পনা নিষ্প্রয়োজন হইয়া আসিতেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই বস্তুকেই চিরদিনের জন্য বিমুখ করিয়া দিয়াছি। কল্পনায় যাহাকে রূপ, আকর, সৌন্দর্য্য, সুষমা দিয়া মনে মনে লালন করিতে আমার লালসার অন্ত ছিল না, চক্ষুর ঠিক সম্মুখেই সে কল্পনা মূর্ত্তি ধরিয়া আবরণ উদ্‌ঘাটিত করিয়া উদিত হইবা মাত্র নিজে ভাল করিয়া সুন্দরকে দেখিয়া তৃপ্ত হইবার পূর্ব্বেই মাঝখানে আবরণ নিক্ষেপ করিয়াছে; সে যবনিকা পুণরায় তুলিয়া ধরিবার সাধ্য কাহারও নাই।' [পৃ. ৬৩-৬৪]

জগদীশ গুপ্ত'র এই গল্পটিতে তাঁর পরবর্তী পরিণতির আভাস আছে। তবে তাঁর উত্তরকালের গল্পসমূহের বিষয় ও বিশিষ্টতা এখানে অনুপস্থিত। আবেগ কম্পিত লেখকের কলমের দুই-চারটি আঁচড়ে নায়িকার সৌন্দর্য অঙ্কিত হয়েছে। নায়কের মুহূর্তের ভুলে নায়িকাকে হারানোর বেদনাচ্ছন্ন পরিস্থিতিসৃষ্টিতে লেখক প্রথম প্রয়াসেই সাফল্য লাভ করেছেন।

এই গল্পের শিল্পমূল্য ছাড়াও এর ঐতিহাসিক মূল্য বিবেচনায় এবং দুষ্প্রাপ্যতার কারণে লেখাটি এখানে সম্পূর্ণ সংকলন করা হল। বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

আশা করি জগদীশ গুপ্ত'র গল্প আলোচনার ক্ষেত্রে এই রচনাটি উপেক্ষিত হবে না। তাঁর পরবর্তী পরিণতি ও মানস গঠনের, লেখক জীবনের প্রস্তুতির কিছু হদিস এখানে পাওয়া যেতে পারে।

'প্রাচী'-পত্রিকা থেকে গল্পটি সংগ্রহ করেছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য শাখায় সংরক্ষিত 'আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ' সংগ্রহ থেকে।

অহেতুক

আমাদের ৩৩ নম্বরের ঠিক পাশের বাড়িটাতে বাস করেন উকিল যাদব বাবু। তাঁহার বাড়ির নম্বর ১৭। ৩৩ নম্বর এবং ১৭ নম্বরের মাঝখানে দেড় ফুট চওড়া একটা সঙ্কীর্ণ গলিপথ। এই সরু গলিপথটার উপর পাঁচ সাতটা বাড়ির ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা খেলাধূলা এবং চীৎকার করে, কাঁদে, ফেরিওয়ালারা বিবিধ সামগ্রী বিচিত্র কণ্ঠে হাঁকিয়া যায়– তথাপি আমাদের এই গলিপথ চিরনিদ্রিতেরই সামিল। বড় বড় রাজপথের উপর দিয়া যখন অনবসর কর্ম্মপ্রবাহ সশব্দে ধাবিত হইতে থাকে তখন মনে হয় পথটিও যেন সেই কর্ম্মের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহারও

বিশ্রাম করিবার সময় নাই, আসিয়া একবার নিশ্বাস গ্রহণ করিবারও অবকাশ নাই। কিন্তু এই ৩৩ ও ১৭ নম্বরের মধ্যবর্ত্তী গলিটার কোন কাজ করিবার নাই, দিনের পর দিন তার শীর্ণ অচল দেহ উর্দ্ধমুখে পড়িয়া দিনে রৌদ্রালোকিত এবং রাত্রে নক্ষত্রখচিত আকাশের একটুখানি দেখিয়া বোধ করি নীশ্বাস* ছাড়িতেই থাকে।

৩৩ নম্বরের বাড়ির আমার ঘরের একটি জানালা ১৭ নম্বরের নীচের তলা হইতে উপরের তলায় উঠিবার সিঁড়ির ঠিক সম্মুখেই বসান'। জানালার নীচের জোড়া খুলিয়া দিলে সিঁড়ি খানিকটা দেখা যায়; কিন্তু জানালা বন্ধই থাকে, খুলিবার দরকার হয় না বলিয়াই খুলি না। এই জানালার ধারেই চৌকি টেবিল পাতিয়া আমি পড়ি এবং যে সমস্ত জিনিষ আছে বলিয়া জানি কিন্তু জন্মে চক্ষে দেখি নাই তাহাদেরই সম্বন্ধে পদ্যাদি লিখি:- সমুদ্র দেখি নাই, গিরি দেখি নাই, সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত, শস্যক্ষেত্র, তাহার উপর বায়ুর লীলা, নদীবক্ষে ছায়া-তরঙ্গ ইত্যাদি। স্বচক্ষে ইহাদের কোনটাই দেখিবার সুযোগ হয় নাই; তবে, প্রচুর পরিমাণে কবিতা পড়িয়া একটা সুফল ইহাই হইয়াছিল যে, না দেখিলেও ইহাদের দৃশ্য যেন অনায়াসেই চখের সম্মুখে ভাসাইয়া দিতে পারিতাম। প্রত্যাখ্যানের দরুণ নিস্ফল ও প্রতিদিনের** দরুণ সার্থক ভালবাসার দুঃখ ও সুখও বুঝিতাম; অবসাদ, শ্রান্তি, ভ্রান্তি ইত্যাদিও যে অনুভব করিতে পারিতাম না এমন নহে। যাক্ এ কথা।

ঐ জানালাটির ধারে একলাটি বসিয়া বসিয়া আমি ঐ গুরুতর কাজগুলি করিতাম, অন্যদিকে কাণ বা চোখ দিবার কারণ প্রায়ই ঘটিত না। ছেলে মেয়েদের তীব্র কণ্ঠ আমার ধ্যানভঙ্গ করিতে পারিত না। দ্বিতীয় প্রকারের শব্দ আসিত ১৭ নম্বরের সিঁড়ি হইতে- নগ্নপদের উঠা নামার খস্ খস্ শব্দ, চটির চটাপট্, শক্ত গোড়ালি জুতার খট্ খট্, খড়মের খটাস্ খটাস্, ছোট ছোট যারা তাদের দ্রুতপদের দুপ্ দাপ শব্দ, শিস ও মৃদুগানের গুণ গুণ শব্দ কত যে উঠিত তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু আমার পয়ার বা পদ্য মিলাতে অনুরূপ ধ্বনির শব্দ খুঁজিবার বিরুদ্ধে তাহাদের কোন ক্ষমতাই ছিলো না। বরং সাহায্যই করিত; যখন মিলের শব্দটি মাথায় আসিয়াও আসিত না তখন অন্যমনস্ক হইয়া শ্রান্ত মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দিবার উদ্যেশ্যে*** ঐ পদশব্দগুলির দিকে মাঝে মাঝে কাণ পাতিয়া থাকিতাম, তাহারা নিতান্ত পরিচিত বলিয়াই মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করিত না, কিছুকালের নিমিত্ত ভিন্ন পথে চালিত করিয়া তাহাকে কল্পনা রাজ্যের দিকে একটা নূতন বেগ দিত।

---

* এর বিশুদ্ধ পাঠ : 'নিঃশ্বাস'। —সম্পাদক

** এর বিশুদ্ধ পাঠ : 'প্রতিদানের'। —সম্পাদক

*** এর বিশুদ্ধ পাঠ : 'উদ্দেশ্যে'। —সম্পাদক

২

বৎসরের একটা দিনে আমাদের ঘরগুলি ভাল করিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া তক্‌তকে এবং স্বাস্থ্যকর করিবার চেষ্টা করা হইত। সেই দিনটাতে সমস্ত জানালা দরজা খুলিয়া দেওয়া হইত। উদ্দেশ্য, পরিষ্কার করিবার ছলে যে ধূলারাশিকে ঝাঁটার প্রহারে স্থানচ্যুত করিয়া ছাদের দিকে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেগুলিকে ঘরের বাহির করিয়া দেওয়া। কিন্তু গৃহকর্ত্তার সে উদ্দেশ্য যে নিষ্ফল হইত তাহার অপর কোনই কারণ নাই, একটিমাত্র কারণ এই যে, যে বায়ুপ্রবাহে ধূলা উড়াইয়া লইয়া যাইবে তাহারই ঘরে প্রবেশ করিবার পথছিল না। চারিপাশের বাড়িগুলি আমাদের গরীব ৩৩ নম্বরের চতুর্দ্দিকে বিরাট দেহ বিস্তার করিয়া এমনই কড়া পাহারা দিতেছে যে পবন এবং তপনদেবের সাধ্যও নাই তাহার ত্রি-সীমানায় পদার্পণ করেন। ধূলা দ্রুতবেগে ছাতের দিকে উঠিয়া ধীরে ধীরে মেঝের দিকে নামিতে থাকিত এবং অবশেষে ঘরের যাবতীয় জিনিষের উপর স্তরে স্তরে পতিত হইয়া, পুনরায় বিতাড়িত হইয়া এক বৎসরের মেয়াদে স্বস্থানে যাইয়া স্থায়ী হইয়া বসিত! ধূলা তাড়াইবার এমনি একটা দিনে আমার টেবিলের ধারের জানালাটার নীচের জোড়াও খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং আমি সেই খোলা জানালা দিয়া অকারণেই ১৭ নম্বরের সিঁড়ির দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিলাম। সহসা সিঁড়িতে একটা খপ্ খপ্ পায়ের শব্দ উঠিতে লাগিল– দেখিতে দেখিতে একপিঠ আর্দ্র এলায়িত দীর্ঘ কেশ, শ্বেতাম্বরের খুব চওড়া রক্তবর্ণ খানিকটা পাড় এবং টুক টুকে আল্‌তা-পরা দুখানি চরণ উঠিয়া আসিয়া দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। এ আবির্ভাবটি একেবারে নূতন। যাদব বাবুর গৃহিণী প্রবীণা, ৩৩ নম্বরে তাহার যাতায়াত আছে। চোখে দেখা দূরের কথা, সর্ব্বসংবাদবাহিকা নীরির মুখেও অ-প্রবীণা আর্দ্র-কুন্তলার অস্তিত্বের সংবাদ পাই নাই। ঐ পর্য্যন্ত—এ আবার কে ভাবিয়া স্বল্পক্ষণের জন্য একটু বিস্মিত হইয়া নিজের কাজে মন দিলাম।

সেই দিন দুপুরবেলায় দেখিলাম, নীরি যেন একটু বেশীমাত্রায় ব্যস্ত। আমার সেফটি পিনের মুখটা থেঁৎলে দিলে কে, এ পাড় আমার পছন্দ হয় না, শুধু সেমিজ পরে' আমি যাব না– ইত্যাদি বিদ্রোহসূচক এবং ক্রোধব্যঞ্জক কথা সে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া বেড়াইতেছিল।

তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম– কোথা, যাচ্ছিস্, নীরি, এত ঘটা করে?

—ও—বাড়ীর বউ দেখ্‌তে যাচ্ছি, নরেন বাবুর বউ এসেছে যে।

বেশী কথা বলিবার অবসর তার ছিল না। ঐ খবরটা দিয়াই সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

আমি ভাবিলাম, তাই বল, নরেন বাবুর স্ত্রীকেই তবে তখন দেখেছি।

জানালার নীচের জোড়াটা বন্ধ রাখাই সাধারণ নিয়ম ছিল,সে-দিন হইতে কি ভাবিয়া নিয়ম উল্টাইয়া দিলাম, খোলা থাকাই সাধারণ নিয়ম হইয়া গেল। এ নিয়মটারও যে ব্যতিক্রম না হইত তাহা নহে, তবে সেটা সময় বিশেষে, যেমন রাত্রি।

পূর্ব্ববৎ পড়াশুনা করি, মিলের শব্দ খুঁজিয়া খুঁজিয়া পদ্য লিখি; কিন্তু ১৭ নম্বরের সিঁড়ির উপর পদশব্দ জাগিয়া আমাকে সাহায্য করা বন্ধ করিয়া দিয়া শব্দানুসন্ধানের ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। বুঝিলাম, চিরদিনকার একটানা অভ্যাসের মাঝখানে একটা স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেই খস্ খস্, খট্ খট্, চটাপট্, দপ্ দপ্ শব্দ— শব্দগুলি সবই এক পর্দ্দায় বাঁধা; হাজারো মোটা গলার মধ্যে একই পর্দ্দার একটা সরু সুরের মত, পায়ের একটা খস্ খস্ শব্দ স্বতন্ত্র এবং চিহ্নিত হইয়া উঠিল, এবং ধারার মধ্যে বিচ্ছিন্নতার মত স্বতন্ত্রভাবেই আমার কাণে পৌঁছিতে লাগিল! শব্দ যত উচ্চ হয়, তত বেশী জোরে সে কর্ণে প্রবেশ করে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম; কিন্তু অবস্থাবিশেষে উচ্চতর শব্দকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া মৃদুতর শব্দও প্রবলতর হইয়া উঠিতে পারে, এই অস্বাভাবিক ঘটনা আমি প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। উৎকর্ণ হইয়া চেষ্টা করিয়া সে শব্দ কাণে আনিবার প্রয়োজন আমার একদিনের তরেও হয় নাই, দ্বিতীয় দিনে না দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম এ শব্দ তাহারই পায়ের, এবং তখন ভুল করি নাই।

সে ওঠে, নামে; তাহার পায়ের শব্দে কবিতা রচনা বিস্মৃত হইয়া আমি চাহিয়া থাকি, দেখিতে পাই– শুধু, দীর্ঘ অবগুণ্ঠন বা এলায়িত আর্দ্র কেশ, সিক্ত বসন, পাড়ের উপর রঙ্গের ছটা, আর পা দু'খানি। সুন্দর পা দু'খানি, যেন চাঁপার পাঁপড়ি দু'টি; আর সেই পাঁপড়ি দুটিকে বেষ্টন করিয়া তাহার বিকশিত রঙ্গিন যৌবনের লোহিতরাগ বিস্ফুরিত হইতেছে। অস্বচ্ছ ঐ অবগুণ্ঠনের অন্তরালে মুখপদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া আছে, জানি না যৌবনশ্রী সেখানে –তার নয়নে, অধরে, ত্বকে, বর্ণে, ভ্রূযুগে– কি অপরূপ অতুল মূর্ত্তিতে পুষ্পিত হইয়া আছে।

কল্পনাকে সচেতন করিবার গুপ্ত অভিপ্রায়ে নীরিকে ডাকিলাম।

— নরেন বাবুর বউকে দেখেছিস্ ?

— দেখেচি। সেই সেদিন গেলুম, দেখে এলুম। দিব্যি বউটি।

— নরেন বাবু যে বল্‌লেন তাঁর বউ দেখ্‌তে অতি বিশ্রী ?

— মিছে কথা। বেশ মুখখানি, হাসি হাসি। আমার সঙ্গে কত গল্প করলে।

— কি গল্প করলি তোরা ?,

— আমি তোমার গল্প করলুম, নিজের গল্প করলুম, সে তার বাপের বাড়ির, ভাই বোনদের গল্প করলে।

— আমার গল্প কি করলে ?

— গল্প করলুম তুমি পদ্য লেখ, খুব ভাল ভাল পদ্য।

— পদ্য লেখার গল্প করে' এসেছিস্ ? তুই আমার পদ্য–

আমার কথার সমাপ্তি পর্য্যন্ত নীরির ধৈর্য্য রহিল না; পান সাজিগে বলিয়া সে চলিয়া গেল।

নীরি বলিয়া গেল, বেশ মুখখানি। "বেশ মুখখানি"– রূপবর্ণনার এই অংশটুকুকে অবলম্বন করিয়া ভাবকে উদ্দীপ্ত এবং বিস্ফারিত করিয়া একটি চতুর্দ্দশপদী খাড়া করা যাইতে পারে মনে করিয়া কাগজ পেন্সিল টানিয়া লইয়া চতুর্দ্দশপদীর প্রথম পদটা প্রাণপণে চিন্তা করিতেছি এমন সময় পদ্য রচনায় বাধা পড়িয়া গেল। পদ্যরচনা সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে সব কাজের মত তাহারও আরম্ভটা বড় কঠিন। যাঁহারা ভাবকে জমাট করিয়া লইয়া লিখিতে বসেন আমি সে শ্রেণীর, অন্য শব্দের অভাবশতঃই বলি, কবি নহি। আমার ভাবগুলি মনের আকাশে অতনু শৃঙ্খলাহীন কুজ্ঝটিকার মত ব্যাপ্ত হইতে থাকে এবং রচনা অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব্ব শৃঙ্খলায় রূপগ্রহণ করিয়া রসে পরিপূর্ণ হইয়া নিঃসৃত হইতে থাকে। সুতরাং সুরুটা জমাইতে আমার অমানুষিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। চতুর্দ্দশপদীর সর্ব্বপ্রথম লাইনটা জমাইতে অসাধারণ প্রচেষ্টায় আত্মবিস্মৃতের মত এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে খোলা জানালা দিয়া দৃষ্টি চলিয়া গেল ১৭ নম্বরের সিঁড়ির উপর এবং দেখিতে পাইলাম সেই তরুণী অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া আমাকেই দেখিতেছে। আত্মবিস্মৃতির ঘোর কাটিয়া মুহূর্ত্তেই আমার মুখ ও কাণ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, এবং তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া দড়াম্ করিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিলাম।

কেন এ কাণ্ড করিলাম, তাহা তখনও জানিতাম না; কেন সে কাণ্ড করিয়াছিলাম, আজও তাহা জানি না। এ যে কি করিলাম তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে আমার যতটা বিলম্ব হইল তাহাকে অনুচিত বিলম্ব বলা যাইতে পারে। জানালা বন্ধ করিতেই তরুণী উঠিল কি নামিয়া গেল তাহা আমি জানি না, পদশব্দ শুনিতে পাই নাই; কিন্তু এ কি গভীর লজ্জার বোঝা অতর্কিতে ঐ নিরপরাধিনীর মাথার উপর চাপাইয়া দিলাম। সে ত' জানে না, আমি কেন একাজ করিয়াছি তাহা আমি নিজেই জানি না, তার কাজটা ভাল কি মন্দ এ তর্কের উদয় আমার মনে হয় নাই, নির্লজ্জতাকে আঘাত করিয়া শাস্তি প্রদানই আমার উদ্দেশ্য, আমার ব্যবহারের একমাত্র অর্থ, ইহাই সে বুঝিয়াছে নিজের অপরাধটাকে হাল্কা করিবার জন্য,

ভাবিতে চেষ্টা করিলাম, বোধ হয় এতটা সে বুঝিতে পারে নাই, হয়ত কিছুই মনে নাই; কিন্তু জোর পাইলাম না। দৃষ্টিতে তরুণীসুলভ কৌতূহল ছাড়া আর কিছুই ছিল না; কারণ আর কিছু থাকা স্বভাবতঃ সম্ভব নহে। নরেন এবং নীরি দুজনায় মিলিয়া আমার সম্বন্ধে তাহার মনে একটা অতিরঞ্জিত অলৌকিক ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়, এবং চাহিয়া থাকার মূলে ছিল সেই কথাটাই। সহজ সরল নিষ্পাপ দৃষ্টির কি একটা অচিন্তনীয় কু-অর্থই না তাহার সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছি! লজ্জার আঘাতে তার মুখখানি বোধ হয় বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। চতুর্দ্দশপদী লিখিব বলিয়া যে কাগজখানা টানিয়া লইয়াছিলাম, তাহারই উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িলাম। আমার এই অপরাধের মার্জ্জনা সে কখন করিতে পারিবে কি?

যাহা সুন্দর তাহাকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিবার যে একটা বিধিদত্ত প্রলোভন জ্ঞান সঞ্চারের সময় হইতে উত্তরোত্তর লেলিহান্ হইতে থাকে তাহার পরিতৃপ্তির দিক দিয়াও আমার লোকসান হইল বড় সামান্য নয়। কল্পনায় একটা অতি স্নিগ্ধ পরম সুন্দর মধুর মুখশ্রী সৃষ্টি করিয়া লইয়া বাক্যে তাহার স্তুতি করিবার উপক্রমে যখন বস্তুর উদয়ে কল্পনা নিষ্প্রয়োজন হইয়া আসিতেছিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই বস্তুকেই চিরদিনের জন্য বিমুখ করিয়া দিয়াছি। কল্পনায় যাহাকে রূপ, আকার, সৌন্দর্য্য, সুষমা দিয়া মনে মনে লালন করিতে আমার লালসার অন্ত ছিল না, চক্ষুর ঠিক সম্মুখেই সে কল্পনা মূর্ত্তি ধরিয়া আবরণ উদ্‌ঘাটিত করিয়া উদিত হইবামাত্র নিজে ভাল করিয়া সুন্দরকে দেখিয়া তৃপ্ত হইবার পূর্ব্বেই মাঝখানে আবরণ নিক্ষেপ করিয়াছে; সে যবনিকা পুনরায় তুলিয়া ধরিবার সাধ্য কাহারও নাই।

৩

পদধ্বনি সিঁড়ি বাহিয়া আহোরণ* এবং অবতরণ করে; অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া স্নানার্থে সে নামে ; স্নানান্তে উঠিয়া যায়। আমি খুঁজিয়া বেড়াই তার সেই অবমানিত চাহনিটি আর একবার সে যদি আয়ত উজ্জ্বল নয়ন দুটি ঘোমটার আড়ালে মেলিয়া রাখিয়া আমার পানে চাহিয়া থাকে। কিন্তু তার নয়নপল্লব আমার দিকে চাহিয়া আর বুঝি উঠিল না, আমার সেই নির্ম্মমতা সে ক্ষমা করে নাই।

মানুষ সময়ে পুত্রশোকও বিস্মৃত হয়; আমারও অপরাধের অনুতাপ, ক্ষমাপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা এবং উৎকর্স**/হইয়া উন্মুখ আগ্রহে পদশব্দ শুনিয়া স্থির দৃষ্টিতে ভিজা চুল দেখাটা কমিয়া আসিতে লাগিল। চতুর্দ্দশপদী কবিতায় মুখশ্রীর স্তোত্র লিপিবদ্ধ করিবার আয়োজন অসমাপ্ত অবস্থাতেই রহিয়া গেল।

---

* এর বিশুদ্ধ পাঠ : 'আরোহণ'। —সম্পাদক

** এর বিশুদ্ধ পাঠ : 'উৎকর্ণ'। —সম্পাদক

৪

সাতমাস পরে শীতের এক মধ্যাহ্নে গায়ে র‍্যাপার জড়াইয়া আমার নিজের সেই স্থানটিতে বসিয়া মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাইতেছিলাম। জানালা খোলা ছিল—হঠাৎ অলঙ্কারের একটা মৃদু শব্দে মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিলাম, তরুণী ঠিক সেই দিনের মত অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া আমাকেই দেখিতেছে। মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টির মিলন হইল, তরুণী অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া উঠিয়া গেল, আমি ক্ষমাপ্রাপ্ত আসামীর মত আনন্দে অধীর হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম।

পরদিন বেলা সাতটার সময় উড়ে বেহারার হুম্ হুম্ শব্দে কৌতূহলী হইয়া জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া দেখিলাম, একখানা পাল্কী চলিয়াছে। পাল্কী চলিয়া গেল। মুখ ফিরাতেই দেখি নীরি আমার পাশেই জানালায় মুখ দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, কে গেল রে? নীরি বলিল, নরেন বাবুর বৌ গেল।

— কোথায়?

— তার বাপের বাড়ি।

তথ্যসূত্র :

১. তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা একটি অনুবাদ-গল্প: "মির্জার স্বপ্নদর্শন" শিরোনামে 'ভারতী'-পত্রিকায় প্রকাশ পায় (শ্রাবণ ১৩১৮)।

দ্র. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড)। ৩য় সং., কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ৩৩৫। রচনাটি আবুল আহসান চৌধুরী জগদীশ গুপ্ত বইয়ে পুনর্মুদ্রণ করেছেন (ঢাকা, ১৯৮৮), পৃ. ১১২-১১৮।

২. সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫।

৩. জগদীশ গুপ্ত'র গল্প-সমগ্র (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৩৮৭।

৪. আবুল আহসান চৌধুরী, জগদীশ গুপ্ত, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৪২।

৫. সুবীর রায়চৌধুরী (সম্পাদক) জগদীশ গুপ্ত'র শ্রেষ্ঠ গল্প, কলকাতা, ২য় সং., ১৯৯১।